আমাদের বর্তমান এবং সকলের দায়

বাংলাদেশের বর্তমান বা বর্তমানের বাংলাদেশ - এই নিয়ে আমরা সবাই এখন কম বেশী চিন্তিত। কিন্তু আমরা কি এ চিন্তা করতে বড় বেশী দেরী করে ফেললাম? অথবা আমরা কি সত্যিকার অর্থেই ততটা চিন্তিত যতটা আমাদের হওয়া উচিত? কিংবা, এমনো তো হতে পারে যে, আমরা বড় বেশী চিন্তা করছি ! এরকম হাজারো প্রশ্ন আমাদের অনেককেই এখন ভাবিয়ে তুলছে। আমরা অধিকাংশই এ বিষয়ে যার যার আয়ত্তের মধ্যে চিন্তা করছি। অনেক কিছু নিয়ে আমরা হতাশ হচ্ছি। আবার অনেক কিছুর মধ্যে আমরা নতুন করে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় যে আমরা অধিকাংশ সময় মূল সমস্যা এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত লঘু বিষয়ে বেশী সময়ক্ষেপন করি। কিন্তু এখন সময় এসেছে ঘটনার অন্তরালের উপাত্ত বিশেষণ করার। সুযোগ পেলে বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কিছু ব্যক্তিগত বিশেষণ পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার ইচ্ছা রয়েছে। তবে এবারের লেখায় আমি বর্তমান ধর্মীয় জঙ্গীবাদের উত্থান, এর উত্থানে সকলে দায় ও উদ্ভূত পরিস্থিতি হতে উত্তরণের উপায় প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত মত প্রদান করতে চাই। এই বক্তব্য গ্রহন বা বর্জন সম্পূর্ণ পাঠকের এখতিয়ার।

আমরা যারা এই ভারতীয় উপমহাদেশে বাস করি, বিশেষত: যারা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিক, তাদের কাছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নতুন কোন ধারণা নয়। রাজনীতি এবং ধর্মকে যখন সম্পৃক্ত করা হয় তখন ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কাঁধে ভর করে ধর্ম নিয়ে রাজনীতিরও চর্চা শুরু হয়। আমাদের উপমহাদেশের তিনটি দেশেই আমরা বর্তমানে এর ব্যপক বিস্তার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তও সমস্যাটা হচ্ছে - যখন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের অন্তরালে ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এক পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে ফেলে, তখনও আমাদের একটা বড় অংশ তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই। এবং এটা অস্বাভাবিকও নয়। কারণ উপমহাদেশের সবগুলো বড় রাজনৈতিক দলই ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে কম বেশী মিশিয়ে ফেলেছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের দেশের বড় রাজনৈতিক দলদুটো এখন এই বাস্তবতা মেনে নিয়েছে। ধর্মকে রাজনীতির বাইরে না রেখে বরং ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে কে বেশী ব্যবহার করতে পারে, সে বিষয়েই তারা বেশী মনোনিবেশ করেছে। কিন্তু আমরা ভুলে গেছি যে ধর্মকে কেন্দ্র করে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় হয় সেখানে প্রথম থেকেই ধর্মীয় সমতা মানুষকে একত্রীভূত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষে মানুষে বিভেদ ঘোচাতে ধর্মের সেতু যে পর্যাপ্ত ছিল না তা অল্প দিনেই বাঙালিরা উপলব্ধি করতে পারে। আমরা উপলব্ধি করতে পারি শুধ্ সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসকে আর্বত করে যে ধর্মীয় ব্যবস্থা তার বাইরেও জাতিগত স্বকীয়তা বলে একটা কিছু আছে যা বাঙালিদের থেকে পাকিস্তানিদের পৃথক করে। আমরা বুঝতে পারি যে ধর্মীয় কৃষ্টির বাইরেও কিছু কৃষ্টি, কিছু সামাজিক ব্যবস্থা আছে যা আমরা বিসর্জন দিতে পারি না। কারণ এগুলোই আমাদের আর দশটা জাতি থেকে আলাদা করে। আর সে কারণেই একই আধ্যাত্মিক ধর্মবিশ্বাসী হয়েও কেউ বাঙালি, কেউ আরব আবার কেউ বা ইন্দোনেশীয়। আর সে উপলব্ধি থেকেই ভাষা আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থান হয়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু স্বাধীনতা শুধু নিজস্ব ভৌগলিক মানচিত্র বা জাতীয় পতাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্বাধীনতার অর্থ নয় শুধু সারিবদ্ধ হয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া। এসব আনুষ্ঠানিকতার বাইরে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে আমরা আরো অর্জন করি একটি সংবিধান যা নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রাচীন একটি জাতিকে দেয় আধুনিক মঙ্গলময় ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা। আর তাই সংবিধানের চারটি মূলনীতির একটি হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার পর পরবর্তী সামরিক শাসনামলে আমরা অনেক কিছুর সাথে যে মূল্যবান জিনিসটা হারিয়ে ফেলি, তা হলো লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত সংবিধানের এই মূলনীতি - যা নিশ্চিত করে যে রাষ্ট্র বাংলাদেশ কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারে না। আর সেই সাথে শুরু হয় আমাদের পেছনে চলা। বাহ্যিক জীবনে আমরা অনেক সামনে এগুলেও মানসিক বিচারে আমরা ক্রমাগতই পিছিয়ে পরতে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন আসে দলগত বা ব্যক্তিগত ভাবে আমরা কতটা চেষ্টা করেছি এই পশ্চাদপসারণ হতে নিজেদের উদ্ধার করতে? এক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম

তথা বুদ্ধিজীবিদের কি ভূমিকা? কোন ভূমিকা থাকলেও তা পর্যাপ্ত কিনা? আমার আজকের পর্যালোচনা আমি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। কারণ দেশের বর্তমান অবস্থার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের কাঁধেই বেশি বর্তায়।

আমাদের দেশের রাজনীতির প্রবাহে দুইটি মূলধারা রয়েছে। একটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের ধারা যারা নিজেদের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারক হিসেবে দাবী করেন। আরেকটি হচ্ছে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা যাদের একটি অংশ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন এবং অপর সহযোগীরা শুধু বিশ্বাস করেন ইসলামিক আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। প্রথমে আসা যাক মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক ধারার বিষয়ে কেননা তাদের কাছেই রাষ্ট্রের উদারপন্থী নাগরিকরা সবচাইতে বেশি প্রত্যাশা করেন। যদিও অপর ধারাটিতেও প্রচুর প্রথিতযশা মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন যারা এখনও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাস করেন বলে দাবী করে থাকেন। কিন্তু তাদের প্রসঙ্গে পরে আসছি। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী সবচাইতে বড় রাজনৈতিক সংগঠনের নাম আওয়ামী লীগ। এ বিষয়ে কারো দ্বিধা নেই যে আওয়ামী লীগ সংগঠন হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির গৌরবময় মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী এক অবিসংবাদিত নেতা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে বাঙালিরা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বাস্তবায়নে আওয়ামীলীগের ভূমিকা কি? সুদূর অতীতের ঘটনাবলীর বিশেষণে না যেয়ে বরং আমরা নিকট অতীতের দিকেই তাকাতে পারি। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিলুপ্ত করা হলেও আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে এখনও ধর্মনিরপক্ষেতা অক্ষুণ্ন রয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ কি ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ করছে বা অতীতে করেছে? নাকি আদর্শের রাজনীতি থেকে ভোটের রাজনীতিই আওয়ামী লীগের কাছে মুখ্য? খুব সামান্য কিছু ব্যাপারে নজর দিলেই বিষয়গুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরা যাক আমাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনের ব্যাপারে। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে রপ্তানীমুখী শিল্পের প্রসার ঘটানো। আর সে জন্যই শুক্রবারের ছুটির হাত থেকে রেহাই চান ব্যবসায়ীরা। এই সামান্য সমস্যাটি সৃষ্টি করেছে এরশাদ, যে কিনা বাংলাদেশের রাজনীতি তথা জাতীয় ইতিহাসের জগতের সবচাইতে দুষ্ট গ্রহদের একজন। কিন্তু আওয়ামী লীগ কি পেরেছে এই শুক্রবারের ছুটি পরিবর্তন করতে? পারে নি। ধর্মনিরপেক্ষতার আরেক উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিকতাকে অগ্রসর হতে দেয়া। আর আধুনিকায়নের পূর্বশর্তগুলোর মধ্যে আছে গণমাধ্যমের প্রচার স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। কিন্তু আওয়ামী লীগ কি পেরেছে বিচার বিভাগকে নির্বাহীর ক্ষমতার আয়ত্তের বাইরে নিয়ে স্বাধীনতা দিতে? তারা কি পেরেছে প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে? অথবা আওয়ামী লীগ কি পেরেছে গণতন্ত্রের মূল শর্ত জনগণের স্বাধীনভাবে ভোটদানের অধিকার নিশ্চিত করতে যার জন্য এখন তারা আন্দোলন করছে? এসকল প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে, এসবই আওয়ামী লীগ পারতো কিন্তু করে নি? সে ক্ষেত্রে প্রশ্নের উদয় হয় যে আওয়ামী লীগের আদর্শ আসলে কি তবে শুধু ক্ষমতায় আরোহন করা? এবার আসি ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে। শেখ হাসিনা কি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবনে প্রকৃতার্থে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছেন। আমরা জানি যে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। কিন্তু ভোটের আগে উনার যে ধর্মপ্রীতি তথা ধার্মিক ক্রিয়াকলাপ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে, সেটা কি কেবলই আন্তরিক ধার্মিক আচরণ নাকি তার সাথে ধর্মভীরু বাঙালি মুসলমানদের মাঝে নিজের ও সেই সাথে তার সংগঠনের একটি ইসলামপন্থী প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনের প্রয়াস নিহিত ছিল? এসব প্রশ্ন প্রতিটি কৌতুহলী নাগরিকের মনেই উঁকি দেয়া স্বাভাবিক। এর সর্বশেষ প্রমাণ আমরা পাই যখন এক আওয়ামী লীগ নেতা সংগঠনের গঠনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অপসারণের আহবান জানিয়ে একাধিক বিবৃতি দেন তার প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ভূমিকা দেখে। সংগঠনের মূল চেতনাতে সরাসরি আঘাত হানার পরও যখন কোন সাংগঠনিক ব্যবস্থা না নিয়ে নিরবতা পালনকেই সংগঠনটির নেতৃনৃন্দ শ্রেয় মনে করেন - তখন স্বভাবতই তাদের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের প্রতি অতীব দূর্বল অঙ্গীকারই প্রতীয়মান হয়।

আওয়ামী লীগের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসার আগে আলোকপাত করতে চাই অপর রাজনৈতিক ধারাটির দিকে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে প্রধানত: দুইটি সংগঠন - বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। সংগঠন দুটি গঠনতান্ত্রিক দিক থেকে সম্পূর্ণ এক নয়। কারণ জামায়াতের উদ্দেশ্য দেশে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বিএনপির গঠনতন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে এই আদর্শকে সমর্থন করে না। কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে এই দলদুটোর মধ্যে সাদৃশ্য অনেক। এই কারণে সমর্থকরাও তাদের আদর্শকে আলাদা করতে পারেন না। আমরা সাধারণ মানুষেরা সবকিছু মোটাদাগে চিন্তা করতেই অভ্যস্ত এবং এই চর্চা শুধু বাঙালিরা কেন বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অধিকাংশ সাধারণ নাগরিকেরাই করে থাকেন। কারণ এসব নিয়ে গবেষণা করার মতো সময় সবার নেই এবং সেটাই স্বাভাবিক। জামায়াতের সমর্থকরা যখন শোনেন যে খালেদা জিয়া বিরোধী দলের নেতা থাকাকালীন সময়ে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে আপত্তিকর কথা বলছেন, তখন তাকে নিজামী বা সাইদী'র একটি উদার রূপ হিসাবেই গ্রহন করেন এবং সমর্থন জোগান। এর পর বিএনপি দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় যাবার পর ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে চিত্রটি আমরা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি তার ঢালাও বিরোধীতা করে এবং যারা এই সব নির্যাতনের ঘটনা জনসমুক্ষে নিয়ে আসতে চেয়েছেন তাদের কঠোর ভাবে অবদমিত করে সরকার ও তার মূল অংশীদার বিএনপি, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তাদের বিরোধীতার চিত্রই তুলে ধরে দেশবাসীর সামনে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিরূদ্ধে জনমত গঠনের অভিযোগে খালেদা জিয়ার সরকার জাহানারা ইমাম তথা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। কিন্তু ইসলামী জঙ্গীরা যখন সরাসরি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং দেশের সংবিধানের রক্ষাকারী আদালতের উপর একের পর এক আঘাত চালাচ্ছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পরার পরেও প্রচন্ড দম্ভ ও ধৃষ্টতার সাথে তাদের উদ্দেশ্যের বয়ান করছে তখন সরকার তাদের দেশদ্রোহী বলতে দ্বিধা করেন। বাস্তবতা হলো এখনও কাউকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় নি, বিচার তো দূরের কথা। অর্থাৎ সরকার বা বিএনপি কেউ এখনও এই জঙ্গীদের রাষ্ট্রদোহী মনে করছে না, মুখে তারা যাই বলুক না কেন। এসব দেখে যদি কেউ বলেন যে সরকার এই জঙ্গী তৎপরতাকে এখনও হালকা ভাবে নিচ্ছে বা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না, তাহলে কি সেটা ভুল বলা হবে? সর্বশেষ আমরা নেত্রকোনায় হামলার পরবর্তীতে যা দেখতে পাচ্ছি, তা অন্তত আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত ও লজ্জিত করেছে। আত্মঘাতী বোমার আঘাতে নিহত নিরীহ মোটর মেকানিক যাদব দাসকে নিয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন তথা মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যে নাটকের অবতারণা করলেন তা দেখে যদি কেউ বলেন জঙ্গীবাদের উৎস অনুসন্ধানে সরকারের আগ্রহ তো নেই-ই বরং সরকার এই সব ঘটনাকে অন্যদিকে প্রবাহিত করে এর থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে - তা হলে কি অন্যায় বলা হবে? তদন্তের সর্বশেষ অগ্রগতিতে জানতে পারলাম যে সরকার যে করেই হোক যাদব দাসকে আত্মঘাতী হামলাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ভাষায় বর্তমান সমস্যায় নতুন মাত্রা যোগ করার নোংরা খেলায় উন্মত্ত। এখন যদি আমরা সরকারের এই দূর্বলতা তথা হীন আচরণের কারণ অনুসন্ধান করতে যাই, তাহলে যা বেরিয়ে আসে তা হলো রাজনীতির ধর্মীয় সমীকরণে বিএনপি এবং জামায়াতের অবস্থান। জামায়াতে ইসলামী একাই অনেক বিশেষণ তথা আলোচনার অবকাশ রাখে বলে এই মুহূর্তে বিএনপির প্রতিই মূল দৃষ্টিপাত করতে চাই। (পরবর্তীতে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকের জামায়াতের রাজনীতি নিয়ে একটি পৃথক লেখা পাঠকদের জন্য উপস্থপন করার ইচ্ছা রয়েছে।) বিএনপি মনে করে বর্তমানে যাই হোক না কেন, কোন ভাবে দোষের বোঝা বিরোধী দল ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে এবং তথাকথিত বৈদেশিক শক্তির জড়িত থাকার কথা বলেই তারা ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের হৃদয় জয় করতে পারবে আর সেই সাথে নির্বাচনী বৈতরনী মসৃনভাবে পার হতে পারবে। সুতরাং বর্তমান সংকট নিয়ে সরকার যতটা না চিন্তিত তার চাইতে অনেক বেশীগুণ চিন্তিত আগামী নির্বাচন নিয়ে। রাজনীতির সমীকরণে বিএনপির প্রধান খালেদা জিয়া সহ অনেক সরকারী নেতাই মনে করেন যে গঠনতন্ত্রে যাই থাকুক, ধর্মভিত্তিক রাজনীতিই তাদের ক্ষমতায় আরোহন এবং ক্ষমতাকে সুসংহত রাখার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়। ফলশ্রুতিতে তারা যে কোন মূল্যে জামায়াতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যেকোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে চায়। আর সে কারণেই রাতারাতি জামায়াতের আচরণের প্রতিবাদকারী সাংসদকে দল থেকে বহিষ্কার করতেও প্রধানমন্ত্রী দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু এভাবে কি বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব?

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একদিকে সরকারী সংগঠন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করাকেই নিজেদের আদর্শ করে নিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বিরোধী দল সরকারযন্ত্রকে মোকাবিলা করতে নিজের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে ক্ষেত্রবিশেষে ত্যাগ করাকেই শ্রেয় মনে করছে। সবাই ধরেই নিয়েছে এভাইে একমাত্র লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। আর বৃহৎ রাজনৈতিক দলদুটোর এই আচরণ দেশে প্রতিক্রিয়াশীল ইসলামী মৌলবাদ এবং তার হাত ধরে জঙ্গীবাদের আগমনের পথ মসৃন করছে। আওয়ামী লীগ সহ ১৪দল দাবী করছে যে বর্তমান সরকারের অপসারণ হলে তারা দেশের এই জঙ্গী সমস্যার সমাধান করতে পারবে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে তা মনে হচ্ছে না। কারণ এই সমস্যার মূলে আঘাত করার মতো সততা, সৎসাহস ও দূরদর্শীতা অন্তত আওয়ামী লীগ এখনও অর্জন করতে পারে নি। আওয়ামী লীগ তাদের পাঁচ বছরের শাসনামলে কি ব্যবস্থা নিয়েছে দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে? বরং প্রতিপক্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির কাজেই বেশি ব্যবহার করেছে। আমাদের দেশের রাজনীতিতে ও জাতীয় জীবনে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি যে হারে বেড়েছে তারই সাথে পাল্া দিয়ে বেড়েছে সীমাহীন দূর্নীতি। বড় বড় দূর্নীতিবাজ আর দুষ্কৃতিকারীরাই সবচাইতে উঁচু ধর্মের ঝান্ডা উড়াচ্ছে। কারণ সবাই বুঝতে পেরেছে যে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর সবচাইতে সহজ পথ এটাই। আর সমাজ ও জাতির এই ধর্মভীরুতা তথা ক্ষেত্রবিশেষে নৈতিক স্খলনকে পুঁজি করেই ধর্মীয় স্বার্থবাদীরা সাধারণ মানুষদের জঙ্গী তথা আত্মঘাতী হবার প্ররোচণা দিচ্ছে। তারা এই দূর্বল মানুষদের মাঝে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে পারছে যে প্রচলিত রাজনীতি, সংবিধান তথা সংবিধান ভিত্তিক আইন ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কি উপায়? ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলো যারা এই পরিস্থিতির জন্য মূলত: দায়ী তারা এখান থেকে মুক্তির কোন যৌক্তিক পথ বাতলাতে পারে বলে মনে হয় না। সরকারে যারা মুক্তিযোদ্ধা আছেন এবং যারা নিজেদের উদার দাবী করেন তাদের বুঝতে হবে যে সরকারের কার্যক্রমে সম্পূর্ণ এর বিপরীত ধারণাই জনগণের মাঝে প্রতিভাত হচ্ছে। সুতরাং এমতাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অসাম্প্রদায়িক শক্তির পূণর্জাগরণ দরকার। প্রয়োজন নির্লোভ, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব - যেই নেতৃত্ব শুধু ক্ষমতায় যাবার স্বপ্নে বিভোর থাকবে না। যেই নেতৃত্ব প্রকৃত সমস্যাকে উপলব্ধি করতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যেকোন ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা বোধ করবে না। বর্তমানে সকল রাজনীতিবিদদেরই কমবেশী একই কথা বলতে শুনি। তারা বলছেন যে ইসলাম এই জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। এভাবে কিন্তু প্রকারন্তরে রাজনীতিবিদরা ধর্মীয় জঙ্গীদের মূল দাবীকে এড়িয়ে যাচ্ছেন, যা হলো সংবিধানের শাসনকে উৎখাত করে দেশে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ তথা আমাদের সকলের বক্তব্য পরিষ্কার হতে হবে। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আমাদের বলতে হবে যে যেকোন উদ্দেশ্যেই সংবিধানকে অস্বীকার করার অর্থ আমাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। আর কোন ক্ষেত্রেই তা মেনে নেওয়া হবে না। কিন্তু যে রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতি হল সৃষ্টিকর্তার উপর পূর্ণ আস্থা এবং রাষ্ট্রধর্ম হল ইসলাম সেখানে সংবিধানের মাধ্যমে কি এই জঙ্গীবাদকেই উৎসাহ দেয়া হচ্ছে না? সুতরাং ব্যক্তি জীবনের ইসলাম পালনকে বাঁধাগ্রস্ত না করে রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পূনরায় প্রতিষ্ঠা ও এর চেতনাকে সমুন্নত করতে হবে। ব্যক্তি জীবনে কোন মানুষ তার স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করবে তা কারও কাম্য নয় - কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের অবস্থানকে সর্বসাধারণের কাছে পরিষ্কার করতে হবে। সকলকে বুঝতে হবে যে ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকতে পারে না। সর্বোপরি ধর্মনিরপেক্ষতা ও নির্বিঘ্ন ধর্মচর্চা যে সহবস্থান করতে পারে সে শিক্ষা আমাদের প্রচার করতে হবে। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সকল শক্তির প্রতি আমার বক্তব্য খুবই পরিষ্কার ও সূক্ষ। নিজেদের শুধু মাত্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বললে হবে না - মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তার অর্জনকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে গণতান্ত্রিক পথে জনগণকে সাথে নিয়ে। রাজনীতিবিদদের সাথে সাথে আমাদের সকলকে ব্যক্তিগত ভাবে আরো সোচ্চার হতে হবে এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা কেউই আমাদের দায় অস্বীকার করতে পারি না। কারণ আমরা মুক্তিযুদ্ধের এই অমূল্য অর্জনকে কোন মতেই হারিয়ে যেতে দিতে পারি না।